ঘরোয়া ও মিতবাক চিত্রকর নন্দলাল

রানী চন্দের বই ‘মানুষ নন্দলাল’ পড়ার পর শিল্পী ও মানুষ নন্দলালকে নতুন করে খোঁজার চেষ্টা সন্ধিনী রায়চৌধুরী-র কলমে।

রানী চন্দ ছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসুর ছাত্রী। তিনি এ দেশের প্রথম মহিলা শিল্পী যাঁর একক প্রদর্শনী হয় দিল্লী ও মুম্বই শহরে। নন্দলালের স্নেহধন্য ছাত্রীদের মধ্যে রানী চন্দ ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর মরমী লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর শিক্ষাগুরুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বইটির নামই বলে দেয় বিষয়খানা। ‘মানুষ নন্দলাল’।

নন্দলাল বসুকে সকলে ‘মাস্টারমশাই’ বললেও তিনি ছিলেন রানী চন্দের নন্দদা। তার কারণ রানী চন্দের বড়দা শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে, যিনি কলকাতা সরকারি চারুকলা শিক্ষা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন – তিনি তাঁকে ঐ নামেই ডাকতেন। আর্ট স্কুলের দোতলায় ছিল সাহেবি আমলের বিশাল ফ্ল্যাট যেখানে অধ্যক্ষ সপরিবারে থাকতেন। সেই ফ্ল্যাটের বিরাট বিরাট ঘর, চওড়া দেওয়াল আর উঁচু ছাদের পশ্চিম দিকের মস্ত বসবার ঘরের মেঝেতে এক সময় ছবি আঁকার ধূম পড়ে গিয়েছিল। সেই ঘরের মেঝেতে দাগ কাটা চার-চারটে ভাগ ছিল। মুকুল দে তার একটি ভাগে শিল্পী যামিনী রায়কে প্রচুর কাগজ ও রঙ দিয়ে বসিয়ে দিলেন। আরেকটা ভাগে ছুটির দিনে অথবা অবসর সময়ে নিজে বসতেন ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে। যামিনী রায়ের পাশের ভাগটা ছিল রানীর। আর একটা ভাগ খালি পড়ে থাকতো। নন্দলাল কলকাতায় এলে বসবেন বলে, কিন্তু সেসময় প্রায়শই তিনি এসে রানীর ভাগেই বসে পড়তেন। বসে বসে যামিনী আর মুকুলের সঙ্গে কথোপকথনের ফাঁকে ফোঁকরে রানীর আঁকা ছবি টেনে নিয়ে তাতে রঙ দিয়ে রূপ ফুটিয়ে রস সিঞ্চন করতেন। তাঁর হাতে যেন জাদু খেলতো। সে সময় এই শিল্পীত্রয় মিলে ছবির বিষয়ে যে সব গভীর কথা বলতেন সেগুলি তখন থেকেই রানীর মনে গেঁথে গিয়েছিল আর তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে তাঁর নন্দদাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। শিল্পী নন্দলালের শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল এইরকমই। মিতবাক নন্দলাল কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী ছিলেন।

সাদা পোষ্টকার্ড কতকগুলি সবসময়ই নন্দলালের সঙ্গে থাকতো। চলতে ফিরতে কথা বলতে বলতে অজস্র পোস্টকার্ড আঁকতেন তিনি। এইসব পোষ্টকার্ডের বেশীরভাগই দিতেন

ছাত্রছাত্রীদের। চিঠিপত্রও লিখতেন এইরকম কার্ডেই; কখনও তাতে কিছু লেখা থারতো, কখনও ছবিই কথা বলতো। তাছাড়াও যখন যেখানে যেতেন যোগাযোগটা সর্বদা রাখতেন। এর ফলে কার্ডে আঁকা ছবিগুলির মাধ্যমেই তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছেকাছেই থাকতেন আর ছবিগুলির প্রাপকেরা যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে না-দেখা জায়গাগুলি দেখে দেখে বেড়াত। একবার তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়ে রানীকে এঁকে পাঠালেন এবং লিখলেন – 'এই পাহাড়ে বুদ্ধদেব থাকতেন, আর চারিদিকের গ্রামে ভিক্ষা করতেন। এটি নিরঞ্জন নদী।'

রানী চন্দের পুত্র অভিজিতের জন্ম-সময়ে নন্দলালকে চলে যেতে হয়েছিল ফৈজপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের তোরণ সাজাতে। সে সময় রানীর জন্য উৎকণ্ঠায় নন্দলাল রানীর স্বামী অনিল চন্দের কাছে কেবলই কার্ড পাঠাতেন। অতঃপর অভিজিতের জন্মের খবর পেয়েই লিখলেন – 'শুভ সংবাদ পাইয়া বড়ো খুশী হলাম। দীর্ঘজীবি হোক্, সুখে থাকুক – আমার আশীর্বাদ।' সেই কার্ডটিতে এঁকেছিলেন শিশুবুকে আঁকড়ে নিয়ে বসে আছে ওখানকারই একটি পাহাড়ি মেয়ে। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সারা জীবন অজস্র চিঠি লিখেছেন নন্দলাল। সেসব চিঠিতে লেখার থেকে ছবিই যেন মুখ্য। যেমন এক ছাত্রকে এঁকে পাঠালেন, একজোড়া তোপসে মাছের ছবি। লিখলেন – 'এখানে মাঝে মাঝে ডিম ভরা তোপসে পাওয়া যাচ্ছে।'

নন্দলালের শিক্ষণ পদ্ধতি কেমন ছিল তার বিবরণ দিয়ে রানী চন্দ লিখেছেন কলকাতায় থাকাকালে প্রথম দিকে রানী একবার একটা কার্ডে রান্নাঘরে পড়ে থাকা পায়ে-পালকে বাঁধা মুরগির ছবি স্কেচ করে নন্দলালকে পাঠিয়েছিলেন – যেটির অতি করুণ অবস্থা, কারণ একটু পরেই সেটি কাটা হয়ে রান্না হবে। এর উত্তরে নন্দলাল তাঁকে যে কার্ড পাঠালেন তাতে একটি রঙচঙে মুরগি বনে ছুটে বেড়াচ্ছে। লিখলেন – 'এটা বনমুরগি, মেরে খাওয়া হয়েছিল, ছবিতে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছি। মুরগি বাঁচাতে শিখলে মেরে খেয়ো।' লেখা আর রেখা এ চিঠিতে মিলেমিশে গেছে। রেখার তুখোড় বাঁকে বাঁকে পাঠিয়েছিলেন এই বন মুরগির ছবি। নন্দলালের শেখানোর বিশেষত্ব এই যে, তিনি ছাত্রছাত্রীদের চোখ ফুটিয়ে দিতেন। তিনি কোনদিন লেকচার দেননি। ছোটোখাটো উপমা দিয়ে অনেক গভীর বস্তু সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। কথাচ্ছলে যে গভীরতার সন্ধান দিতেন, যে ইঙ্গিত ছাত্রছাত্রীরা পেতো তা মন্ত্রের মতো কাজ করতো তাদের জীবনভর। নন্দলাল শুধু শিক্ষাগুরু ছিলেন না, তিনি দীক্ষাগুরুও ছিলেন। কলাভবনে নন্দলাল যখন নিজের জানলার ধারে তাঁর নিজস্ব জায়গায় বসে ছবি আঁকতেন তখন ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ঘিরে বসে ছবি আঁকা দেখতো। দিনান্তে তিনি যখন আশ্রমে ঘুরে বেড়ান, তারাও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। চলতে ফিরতে নানা কথায় কত

কিছু তিনি শিখিয়ে চলেন। তাঁর সঙ্গই ছিল শিক্ষার একটি অঙ্গ। এমনি করেই রানীর কাছে তাঁর নন্দদা কলাভবনের মতই আপন হয়ে গেলেন। তিনি যে গুরু সে দূরত্ব আর রইলো না।

রানী চন্দের লেখায় নন্দলালের অনেক ভ্রমণস্মৃতি পাই। মানুষের দুঃখে তিনি যেমন কাতর হতেন, প্রকৃতির দুঃখও তাঁকে তেমনি ব্যথিত করে তুলতো যে তার নিদর্শন আছে 'মানুষ নন্দলাল' বইতে। নন্দলাল সেবার হাজারিবাগ থেকে লিখলেন – 'পাহাড় জঙ্গল শালগাছ ধূ ধূ করছে। লোকজন চলছে, কোন স্ফূর্তি নাই। কে এদের এমন করে মেরে দিয়েছে? দেখলে মনটা শুকিয়ে যায় – বড় নিরাশ হতে হয়। হাহাকার পড়ে গেছে। ছবি আঁকি কান্নার মত, চোখের জল ধরে রাখা যায় না, ঝড়ে পড়ে। ইহাতে কাহারো উপকার নাই। উপায়ও নাই বটে। ... ... আকাশটা বিধবার সাদা কাপড়ের মত দেখাচ্ছে, দেখলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে।'

নন্দলাল ছিলে রানীর সকল সুখ দুঃখে নিত্য শুভাকাঙ্খী বন্ধুর মত। তাই এই বইটিতে তিনি নন্দলাল সম্পর্কিত টুকরো টুকরো স্মৃতির রত্নকণা উপুড় করে দিয়েছেন। একবার অনিল চন্দের টাইফয়েড হয়। তখনকার দিনে এ রোগের কোন ঔষধ ছিল না। রোগীকে কেবলমাত্র শুশ্রুষার উপরই রাখতে হতো। নন্দলালের যত ভাবনা অনিলের জন্য তার চাইতে বেশি চিন্তা রানীর জন্য তাই তো কার্ডে লেখেন – 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, অনিল শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবে, এ আমার আন্তরিক আশীর্বাদ।' চিঠিতে যা লিখলেন তার শতশতগুন আশীর্বাদ পাঠালেন একটি কার্ডে যাতে একটি অশ্বত্থ পাতার শুকনো জালি আটকে চারিদিকে কালো লাইনের নকশা এঁকে মধ্যে দুটি কচি সবুজ পাতার ডগায় একটি লাল হলুদ পাপড়ির ফুল ফোটালেন। এ যেন নিরস নিষ্প্রান শুকনো পাতার জালির বুকে আবার রঙে রসে প্রাণ ফিরে আসবে, ফুল ফুটবে। বললেন, 'ভয় নেই, আবার সব হবে।' স্বল্পভাষী নন্দলাল ছবির জগতেই ফাঁকে অবকাশে নিজেকে একটু ছড়িয়ে দিতেন। ঐ একটুতেই যোগাযোগ গভীর হতো। একবার লিখলেন – 'অবসাদ এখনও ঘুচে নাই। জানি চিন্তা করে ফল নাই, চিন্তা করা অভ্যাস হয়ে গেছে মাত্র। পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ভরে গেছে, গুরুগুরু ডাকছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়। চোখে জল ভরে আসছে আনন্দে না অভিমানে। ভগবানের উপর অভিমানও হয়, ভালোও লাগে – এ বড়ো অদ্ভুত।'

প্রয়োজন বুঝে ছাত্রছাত্রীর কাজের স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিতেন। তার কথা তো নয়, সবই ছিল নির্দেশ। বলতেন, 'জানো মরচে যাতে না পড়ে সেজন্য তলোয়ারটাকে সবসময়

ধার দিয়ে রাখতে হয় যেমন তেমনি আবার আমাদের হাতেও মরচে পড়তে দিও না।' এজন্যই শান্তিনিকেতনের বাইরে মাঠ ঘাট পেরিয়ে, রেললাইনের ওপারে পিকনিক করতে যাওয়ার সময়ও কলাভবনের সকলেরই কাঁধে থাকতো ঝোলায় ভরা স্কেচ করবার সরঞ্জাম। যথারীতি সেই ঝোলা থেকে সাদা কার্ড, পেন্সিল হাতে নিয়ে স্কেচ করতে করতে চলা। যেখানেই যাওয়া হোক না কেন গাছতলায় বসে গল্প করতে করতে স্কেচ করা। পিকনিক যাওয়ার পথটুকু তো হেঁটে চলা নয়, যেন হাওয়ায় ভেসে যাওয়া।

শোনা যায় ১৯০৭ বা তার পরের বছরগুলিতে নন্দলাল দেশের প্রাচীন কলাকেন্দ্রগুলি দেখার জন্য ভারত-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। দেশজুড়ে শিল্পের একটি কলাকেন্দ্র থেকে অন্য আর এক কলাকেন্দ্রে ঘুরে যখন কলকাতায় ফিরলেন তখন মেতে উঠলেন কালিঘাটের পট আর লোকশিল্প নিয়ে। পটুয়া নিবারণ ঘোষদের কাছে গিয়ে অতি দ্রুত রেখা ও রঙের কাজে সেই শিক্ষা গ্রহণ করলেন। কবি আর চিত্রকর ভুবনডাঙার মাঠেই স্বপ্ন দেখলেন নতুন এক শিল্প বিদ্যালয়ের। গড়ে উঠলো কলাভবন। তিন দশকের প্রচার বিমুখ নন্দলাল শান্তিনিকেতনে একে একে ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের মত শিল্পীকে। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-র (১৮৮২-১৯৬৬) মৃত্যুর খবর জেনে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন – 'তাঁর শিল্প-প্রতিভার সাক্ষ্য ইতিহাসে থাকবে এবং ভাবীকালের মানুষ তা উপভোগ করবে। তাঁর জীবনের কথাও লেখা হবে, কেবল ভাবীকাল পাবে না নন্দবাবুর সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ।' রানী চন্দের লেখা 'মানুষ নন্দলাল'-এ আমরা যেন সেই অসামান্য শিক্ষাগুরুর একটা প্রতিচ্ছবি পাই।

রানীর স্বামী অনিল চন্দ ছিলেন কৌতুকরসে ভরপুর। নন্দলালের সঙ্গেও ছিল তাঁর এই রসেরই সম্পর্ক। নানা কৌতুক রসের আদান প্রদান হত এঁদের দুজনের মধ্যে। নন্দলাল এটা উপভোগ করতেন বলেই বিট্ঠলনগরে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য যখন গেট তৈরি হচ্ছে তখন একটা কার্ডে এঁকে পাঠালেন – নন্দলাল ভারার উপরে উঠে বসেছেন, ভিতরে গাধারা ঢুকে নিশ্চিন্তমনে চরে বেড়াচ্ছে। পাশে লিখেছেন – 'অনিল, গেটের খবর ইহারা জানে না এবং নন্দলালকেও চেনে না। পরে এখানে কড়া পাহারা বসবে, টিকিট লাগবে।'

এসব কথা কাহিনীর যেমন শেষ নেই, তেমনি মজার মজার ঘটনারও উপস্থাপন করেছেন রানী চন্দ 'দৃশী পাবলিশার্স'-এর সুদৃশ্য শীর্ণকায় বইটিতে, যার প্রথম প্রকাশ ১৬ই এপ্রিল ২০১২।

মানুষ নন্দলাল ॥ রানী চন্দ ॥ দৃশী পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০১১৮ ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৬ এপ্রিল ২০১২।

চিত্র পরিচিতি : ১। মানুষ নন্দলাল বইটির প্রচ্ছদ; ২। শিল্পী নন্দলাল বসু; ৩। রানী চন্দ; ৪। নন্দলাল বসুর আঁকা স্কেচ।